মেয়েদের লেখা উপন্যাস : আত্মপরিচয়ের সন্ধানে যাত্রা (১৯০১-১৯৪৭)

শ্রাবণী পাল

।। এক।।

''কি বর্ত্ত করালি সই কাঁদতে জন্ম গেল''

> আমরা নারী জাতির যে অবস্থা ভাবিয়া দেখি,...তাহাদিগের শৈশবাস্থার অনাদর, বৈধব্যের দারুণ কষ্টভোগ, বধূ অবস্থায় যন্ত্রণা এবং বার্ধক্যের হতাদর এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাদিগের জীবিত কাল অতি শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়া আছে। আজীবন তাহাদিকের নয়নে কেবল অশ্রুবারি বর্ষিত হয়। শৈশবে তাহারা জনক জননীর বিশেষ ভাবনার কারণ, যৌবনে স্বামীর নিরতিশয় সতর্কতার বস্তু এবং বার্দ্ধক্যে সন্তানগণের গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া কালাতিপাত করে। এই জন্য তাহারা সময়ে সময়ে সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকে— ''কি বর্ত্ত করালি সই কাঁদতে জন্ম গেল।'' (আমাদিগের নারীজাতির অবস্থা)

বামাবোধিনী পত্রিকায় (শ্রাবণ ১২৮১) প্রকাশিত এই আক্ষেপ বাঙালি মেয়েদের অনেকদিনের সহচরী যেন। অনূঢ়া কিংবা নবোঢ়া, বিবাহিতা কিংবা বিধবা সব অবস্থাতেই বাংলাদেশের মেয়েদের জীবন প্রায়শ বেদনা আর বঞ্চনার টানাপোড়েনে বোনা। উনিশ শতক শুধু নয়, বিশ শতকেও নানা লেখায় তাই বারবার ফিরে এসেছে 'পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগী' কিংবা 'জালে বন্দী মীন' -এর উপমা। বাল্যবিবাহ, সপত্নী-সমস্যা, ক্রমাগত সন্তানের জন্মদান, পারিবারিক নানা নিগ্রহ, অশিক্ষা কুসংস্কার আর অবরোধে যথাপিত জীবনে মাঝে মাঝে মুক্তির স্বাদ এনেছিল উনিশ শতকের কিছু সংস্কারমূলক আন্দোলন। মেয়েরা স্কুল যেতে শুরু করেছিল, ক্রমশ কলেজে আরো পরে বিশ্ববিদ্যলয়ে; জীবনের জীবিকার আরো কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্রমশ বাড়ছিল তাদের যাতায়াত, কিন্তু সাধারণ 'হিন্দু মহিলাদিগের হীনাবস্থা'য় পরিবর্তন তেমনভাবে হয়নি। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরো কিছু দিন। সমস্যাটা শুধু সমাজের ছিল না, পুরুষের আরোপিত ছিল না; মেয়েরা নিজেরাও দীর্ঘদিন বিশ্বাস করে এসেছে।

> ''সামাজিক জীবনে তাঁর ব্যক্তিগত বুদ্ধির কোনো মূল্য নেই। তার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ হবে তাঁর স্বামীর বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে'' (আদর্শ স্ত্রীর আদর্শ, রেণুপ্রভা রায় বি. এ. বঙ্গলক্ষ্মী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯)

দীর্ঘলালিত এইসব সংস্কারের বেড়া ভেঙে জগৎসভায় নিজেদের প্রকাশ করতে প্রতিষ্ঠা করতে তাই সময় লেগেছিল অনেকটাই— পিছুটান আর চরৈবেতির মন্ত্রে, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের আবর্তে অস্থির সমাজ ক্রমশ তাড়িত করেছিল সংবেদনশীল নারীদের লেখনীধারণে— বিশ শতকে তাঁদের হাতে নির্মিত হল মেয়েদের নিজস্ব ইতিহাসের বয়ান।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে যে সব মহিলা উপন্যাস লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, বেগম রোকেয়া, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, গিরিবালা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শান্তা দেবী ও সীতা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, জ্যোতির্ময়ী দেবী, আশালতা সিংহ, আশাপূর্ণা দেবী, সাবিত্রী রায় বাণী রায়, আমোদিনী ঘোষ, বিমলপ্রতিভা দেবী, শান্তিসুধা ঘোষ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী যেমন, লিখতে শুরু করেছিলেন উনিশ শতকেই, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে তাঁর তিনটি উপন্যস প্রকাশিত হয়েছিল— বিচিত্রা (১৯২০), স্বপ্নবাণী (১৯২১) ও মিলনরাত্রি (১৯২০)। আবার আশাপূর্ণা দেবীর বেশিরভাগ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়েয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সাবিত্রী রায়, বাণী রায় কিংবা প্রতিভা বসুর দু-একটি উপন্যাস ১৯৪৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত হলেও তাঁদের স্বাতন্ত্র-চিহ্নিত উপন্যাসগুলি রচিত হয়েছে এইসময়কালের পরেই। মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম ১৯২৬-এ কিন্তু তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তাছাড়া উনিশ শতকের উত্তরাধিকার বহন করে যাঁরা এইসময়ে লিখতে বসেছিলেন, কালের যাত্রায় তাঁদের লেখার বিষয় ও বিন্যাস দুই-ই বদলে গেছে অনিবার্যভাবেই। বিশ শতকের সূচনায় লেখকের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, দুই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত বিক্ষত পৃথিবীর ছবি স্বভাবতই পরে তাঁদের দেখার চোখ ও মন দুই-ই বদলে দিয়েছিল। গার্হস্থ্য জীবনবর্ণনার মধ্যে তখন লেগেছিল সমাজনীতি, রাজনীতির ভিন্ন ভিন্ন সুর। এইভাবে মা (১৯২০), দিদি (১৯১৫), পদ্মরাগ (১৯২৪), রায়বাড়ি (পত্রিকা প্রকাশ ১৩৭০, প্রবাসী), বিজিতা, সেখ আন্দু (১৩২৪), বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ (১৩৫৫), অমিতার প্রেম (১৯৩৪), প্রেম ও প্রয়োজন(১৯৪৪), সৃজন (১৯৪৬), ফস্কা গেরো (১৩৮৮), নতুন দিনের আলো (১৯৩৩), ১৯৩০ সাল প্রভৃতি উপন্যাসের আখরে ধরা পড়েছে বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলাদেশের পরিবার - সমাজ - অর্থনীতি - রাজনীতির ইতিহাস, অবশ্যই তা' মেয়েদের চোখে দেখা, মেয়েদের ভাষায় লেখা। স্বতন্ত্র কিন্তু প্রয়োজনীয় ইতিহাস

।। দুই।।

> ''জীবনের পথে মেয়েদের পাথেয় আমাদের সমাজে কখনোই কেউ পায় না। তাকে তৈরি করা হয় সমাজের জন্য। জীবধাত্রীত্বের জন্য। জৈবজীবনের যত কিছু প্রয়োজনের জন্য— রন্ধন, সেবা, সন্তানলালন আর পারিবারিক কাজ। অর্থাৎ বহুজনের মনরাখা জগতের জন্য এককতায় তাকে মানুষ হিসেবে মানুষ করা হয় না, কাজে লাগানোর উপকরণ হিসেবে দেখা হয়।'' (জ্যোতির্ময়ী দেবী, 'আমার লেখার গোড়ার কথা', ১৯৮৮)

সাধারণভাবে এই মানসিকতাই প্রতিফলিত হয়েছে বিশ শতকের প্রথমদিকের কিছু উপন্যাসে। একে অবাঞ্ছিত নারীজন্ম, তারপর বাল্য বা কৈশোর বিবাহ, শ্বশুরবাড়িতে সংস্কার- শাসনের নিগড়বদ্ধ প্রায় বন্দীজীবন, সন্তানের জন্ম দিতে দিতে ফুরিয়ে যাওয়া জীবন— এই-ই ছিল সেদিনকার মেয়েদের ভবিতব্য। শুধু পুরুষ নয়, মেয়েরাও সেদিন পুরুষ-নির্ধারিত নিয়মের সীমার মধ্যেই নিজেদের দেখতে অভ্যস্ত ছিল, নিশ্চিন্ত ছিল। ফলত, এইসময়ের উপন্যাসে বাঙালির গার্হস্থ্যজীবনের চিত্রায়ণে মেয়েদের জন্য একটি আদর্শায়িত ভূমিকাই ছিল বরাদ্দ। রমণীর গুণেই যে সংসার সুখের হয়— এইরকম একটি মহতী আদর্শের চালচিত্রে নিজেদের ভূমিকাপালনে গৌরবান্বিত হত যে মেয়েরা, তাঁদের উপন্যাসেও স্বভাবত তা-ই কোনো প্রশ্ন থাকত না, প্রতিবাদ থাকত না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ - শাসিত পরিবারের সনাতন ঐতিহ্যের এই 'শৃঙ্খল' - কে 'অলঙ্কার' মনে করেই সুখী ছিলেন তাঁরা— আদর্শ জননী আর আদর্শ পত্নী হয়ে ওঠাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ এবং মনে করেছিলেন এর মধ্যেই রয়েছে তাঁদের নারীত্বের চরম সার্থকতা।

এই ভাবনার প্রতিফল লক্ষ্য করা যায় অনুরূপা দেবী (জন্ম ১৮৮২), নিরুপমা দেবী (জন্ম ১৮৮৩) কিংবা গিরিবালা দেবীর (জন্ম - ১৯৯১) উপন্যাসে —মূলত গ্রামকেন্দ্রিক ঘরোয়া বাঙালিসমাজের কাহিনীতে। অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাম 'মা' (১৯২০) এবং মনোরমা এখানে সমাজ কাঙ্খিত আদর্শ পত্নী ও আদর্শ জননীর প্রতিনিধি। স্বামী পিতৃসত্য রক্ষা করেছে, বিনা দোষে স্ত্রী পরিত্যক্ত হয়ে বহু কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করেছে, সন্তান প্রশ্ন করেছে; কিন্তু কখনও মনোরমা স্বামীর দিকে অভিযোগের তর্জনী তুলে ধরেনি। বরং বারবার স্ত্রীসন্তান-ত্যাগী সেই পিতার প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা জাগিয়ে রাখতে চেয়ে তাকে বুঝিয়েছে—

> যদি তিনি নিয়ে যান, আপনিই যাবেন। যদি নিয়ে যাবার উপায় না থাকে তবে অনর্থক ওঁর মনে আমরা কষ্ট দিতে যাব কেন?

তাঁর 'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫) উপন্যাসেও অনুরূপা দেবী বিবাহের মন্ত্রশক্তি তথা সমাজে সনাতন সংস্কারের প্রভাবকেই জয়যুক্ত করেছেন, দরিদ্র পুরোহিত অম্বরনাথকে বাধ্য হয়েই বিবাহ করে বাণী এবং তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, বিবাহের পর থেকে তদের দুজনের মধ্যে কোনো সম্বন্ধই থাকবে না। প্রতিজ্ঞা পালন করেছিল অম্বর, কিন্তু সাপ যেমন মন্ত্রের জাদুতে বশীভূত হয়, তেমনই 'ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্ততেহস্তু' এই বেদমন্ত্রের শক্তিতে বদলে যায় আভিজাত্যের অহংকারমত্ত বাণীর জীবন। অম্বরের সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা হলে সে বলতে চায়—

> আমার পাপপ্রতিজ্ঞান সকল ভুল আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।— আমি তো স্ত্রী—ওগো দয়া করিয়া আমায় গ্রহণ কর।

মুমুর্ষু স্বামীকে নিজের প্রেম দিয়ে সঞ্জীবিত করার সাধনায় বসে বাণী, ভাবে—

> সাবিত্রী তাঁর মৃত স্বামীকে বাঁচিয়েছিলেন, আর আমি পারব না? কেন আমি কি সতী স্ত্রী নই? না- আমার শরীরে আমার সতীলক্ষ্মী পুণ্যবতী মা-ঠাকুমায়ের রক্ত বইছে না?

এমনকি বাণীর মা-ও মৃত্যুকালে তার স্বামীকে বলেছে—

> স্বামী ছাড়া মেয়েমানুষের কোনো কিছুই বড় নয়। অন্য সুখ, অন্য কামনা, এমনকি অন্য দেবতাও তার থাকতে নেই। এই শিক্ষাই ওকে দিও।

স্বামিত্ব আর সতীত্বের এই শোণিতাবহ সংস্কারের শেষপর্যন্ত ভেসে গেছে বাণীর শিক্ষা গর্ব আর আভিজাত্য। বাণীকে শেষপর্যন্ত পতিপ্রেমে সমর্পিতা দেখিয়েই লেখিকার স্বস্তি। এই 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাসে অজ্জা চরিত্রটিও সনাতন মূল্যবোধের ছাঁচে গড়া। তাই মদ্যপ নটীবিলাসী স্বামী মৃগাঙ্কের হৃদয় - পরিবর্তন পর্যন্ত নীরবে সে অপেক্ষা করেছে, তার সেবা-শুশ্রূষায় কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। মৃগাঙ্ক তাকে স্ত্রী-র মর্যাদা দেয়নি। দরিদ্রকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে স্ত্রী-কে 'বন্ধু' বলে, বিলাসের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। আহত অজ্জা অভিমানে আক্ষেপ করে—

> 'যদি কখনো সে যথার্থ সহধর্মিণী হইতে পারে, তবে তাহার এ দেহমনপ্রাণ সর্বস্বই তাহার হৃদয়দেবতার চরণতলে সমর্পণ করিয়া আপানর নারীজীবন সার্থক করিবে।'

অজ্জার ইচ্ছাপূরণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা সনাতন ঐতিহ্যের সেই পরিচিত পথেই—দুশ্চরিত্র মদ্যপ বহুগামী স্বামীকে কেন ভালোবাসবে এ প্রশ্ন তার মনে কোনোদিন ওঠেনি, অজ্জা তার পূর্বজাতের পথেই হেঁটেছে স্বামিত্বের আদর্শ শিরোধার্য করে। মৃগাঙ্কের চারিত্রগত পরিবর্তনও এখানে অনুল্লেখ্য নয়, লেখিকার সহানুভূতি থেকে চরিত্রটি একেবারে বঞ্চিত হয়নি।

সমাজ-নির্ধারিত আদর্শ স্ত্রী বা জননীর এই ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারেননি নিরুপমা দেবীও। শরৎচন্দ্রের 'শুভদা' উপন্যাসের শুভদার সঙ্গে নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র সতীর সাদৃশ্য থাকলেও তার প্রতিবাদী মনোভাবই চরিত্রটিকে স্বতন্ত্রতা দিয়েচে, যদিও শেষপর্যন্ত পুরুষ-শাসিত সমাজের অনুশাসনকে সে পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারেনি। সতীর সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাবকে একদিন অনেকটা খেয়ালের বশেই হোক বা নিজের মন বুঝতে না পারার জন্যই হোক, প্রত্যাখ্যান করেছিল বিশ্বের। সেদিন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে তরুণী সতীর বিবাহ দিয়ে তার অসহায় পিতা জাতিনাশের দায় থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছিলেন, বাঁচাতে পারেনি নিজের মেয়েকে অকালবৈধব্যের হাত থেকে। সংসারের দারিদ্র্য থেকে মুক্তির

জন্য, নিজের জীবনের ভার থেকে মুক্তির জন্য আত্মখণ্ডনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সতী, আত্মমর্যাদা দিয়ে আড়াল করেছে তীব্র অভিমানকে, তার শেষ চিঠির অক্ষরগুলি সিক্ত হয়ে উঠেছে সেকালের আরো অনেক ভাগ্যহতার চোখের জলে— বিশ্বেশ্বরকে সে সরাসরি প্রশ্ন করেছিল—

> তুমি আমাদের কে, যে তোমার দয়া আমরা লইব?...মনে ভাবিও না যে, অন্যের পরিগৃহীতা হইয়াও, বিধবা হইয়াও কেবল পরপুরুষকে চিন্তা করিতাম। আমরা বাঙালী হিন্দু কন্যা, কষ্ট হইলেও আমরা দুই দিনেই নিজের অবস্থায় মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া লই।...

মৃত্যুক শিয়রে নিয়ে নিজেকে, নিজের হৃদয়কে উন্মুক্ত করেছিল সতী, সগর্বে বলেছিল—

> আমি এখন অহঙ্কার করিয়া বলিতেছি, এই আজ প্রথম এবং শেষ— আমি তোমার স্ত্রী হইবার নিতান্ত অযোগ্য ছিলাম না।

নারীচরিত্রের এত অকুণ্ঠ প্রকাশ সেদিন বিরলই ছিল, এতখানি জীবনীশক্তি নিয়েও শেষপর্যন্ত হারিয়ে গেছে, মরে গেছে সতীরা, তাদের জন্য আর কোন পথ খোলা রাখতে পারেননি তার স্রষ্টা। নারী হয়েও নারীজীবনের এতখানি অপচয় তাঁরাও সেদিন যেমন মেনে নিয়েছিলেন, শুধু অভিশাপই দিতে পেরেছিলেন—সতী তাই বিশ্বেশ্বরকে বলেছিল—

> এই অধম জাতিকেই একদিন তুমি ভালবাসিবে, এ অধম জাতি বুকের মধ্যে কতখানি সমুদ্র লুকাইয়া রাখে, একদিন তাহা মর্মে মর্মে বুঝিবে। সেদিন স্বীকার করিবে, সংসারে সেই স্নেহের আদান-প্রদানই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সুখ।

নিরুপমা দেবীর উপন্যাসের নারীচরিত্রের এইখানেই স্বাতন্ত্র্য যে, আপাতদৃষ্টিতে তারা সামাজিক অনুশাসনকে মান্যতা দিয়েছে, কিন্তু নিজের মধ্যে প্রতিবাদের জায়গাটা রেখে দিয়েছে। পুরুষের একাধিক বিবাহজনিত দাম্পত্যসমস্যা পুরুষের লেখনীতে একভাবে ধরা পড়েছিল, কিন্তু নারী কীভাবে দেখে এই সংকটকে—নিরুপমা দেবীর 'দিদি' (১৯২৫) উপন্যাসে তার সংবেদী স্বাক্ষর আছে। অমরনাথ চারুকে ভালোবাসে বিয়ে করার পর জমিদারতনয়া সুরমা 'স্বামী' অমরনাথকে সরাসরি অভিযুক্ত করেনি, বরং সংসারের পরিসরে থেকেও এমন এক নির্লিপ্ত ভূমিকা নিয়েছে, যাকে অমনরনাথও অস্বীকার করতে পারেনি। নিহিত জেদে অমরনাথের প্রেমকে প্রতিহত করেছে সুরমা, সংসার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু নিজের মনকে শান্ত করতে পারেনি, শেষপর্যন্ত সে 'স্বামীর ভাগ' নিতে এসেছে। 'শ্যামলী' (১৯১৮) উপন্যাসেও মূক- বধির স্ত্রী-র সঙ্গে অনিলের। দাম্পত্যকে, অনূঢ়া রেবার প্রতি অনিলের প্রেমকে আগাগোড়া অনুক্ত অথচ অবিচল রেখেও সমাজ-নির্দিষ্ট বিবাহ সম্পর্কে কতগুলি প্রশ্ন তুলেছিলেন নিরুপমা দেবী। উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়ণের সুবাদে একসময় বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সামাজিক অনুশাসনকে পুরোপুরি লঙ্ঘন করা যায়ও না। নিরুপমা দেবী সে চেষ্টা করেনওনি; তবে বিবাহ-অতিরিক্ত বা বিবাহ-ব্যতিরিক্ত এক ভালোবাসার সম্পর্কের আলো-ছায়ায় তাঁর উপন্যাসের রেবার মতো মেয়েরা যখন চলাফেরা করে, তখন বোঝা যায় তিনি নারীর নিজস্ব সত্তার বিকাশের প্রতি কীভাবে যত্নশীল ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছেন।

গিরিবালা দেবীর (জন্ম ১৮৯০) 'রায়বাড়ি' (বৈশাখ ১৩৭০ থেকে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ) এক স্মৃতিকথামূলক উপন্যাস যেখানে যৌথ পরিবারে অজস্র গার্হস্থ্য আচার-অনুষ্ঠানে ঘেরা মেয়েদের অন্দরমহলের খুঁটিনাটির পাশাপাশি ধরা রয়েছে ইংরেজি - শিক্ষিত পুরুষের কর্মযজ্ঞের ছবিও। অগ্রজাদের তুলনায় বিনু যে লেখাপড়ার সুযোগ বেশি পেয়েছে, তার শ্বশুররের আগ্রহ রয়েছে 'বৌমা'কে লেখাপড়া শেখানোর, এখান থেকেই বোঝা যায় সময় কিছুটা বদলে গেছে। নতুন যুগের জন্য নিজেকে তৈরি করে নেবার শিক্ষা নিতে হয়েছে রাত্রিবেলা, পুজোর ছুটিতে বাড়ি আসা কলেজ পড়ুয়া স্বামীর কাছে। এই শিক্ষাই ক্রমশ পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে সচেতন করছে বিনুকে, বিনুদের; তখন পুরুষের বহুবিবাহ ধিক্কৃত হয় তার গলায়—

> একটা পুরুষের দুই-তিনটে বৌ শুনলে আমার ঘেন্না করে। মেয়েদের যেমন এক স্বামী, পুরুষদের তেমনি এক বৌ থাকবে। মানুষের চরিত্রই যদি না থাকে, তাহলে থাকল কী?

নিতান্ত 'মাটির ঢেলা' থেকে তাহলে উত্তরণ ঘটছে মেয়েদের, যেখান থেকে সে বলতে পারছে— পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকার ব্যাপারে তার ঘৃণার কথা। সেইসময়ে মেয়েদের ব্যাপারে সমাজে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত ছিল, বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহ ও বৈধব্য এবং সপত্নী-সমস্যা— ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের অনুদার সংকীর্ণতার দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ বদলে যাচ্ছিল— এই বদলটাকে অনেক গভীর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন গিরিবালা কিংবা নিরুপমা দেবী প্রমুখ। তাই মেয়েরাই যখন বলে এ জগতে টিকে থাকতে গেলে একজন রক্ষক চাই, নির্ভরস্থল চাই; তখন তার উত্তরে পুরুষই বলে—

> নিজের জাতটাকে তোমরাই পঙ্গু বানিয়ে তুলছ। রক্ষক চাই, নির্ভরস্থল চাই! আমি বলি, ধর্মে মতি থাকলে, চরিত্রে বল থাকলে মেয়েরা নিজেই নিজের রক্ষা করতে পারে। যাদের তা নেই, তাদের পতন অনিবার্য।

'খণ্ডমেঘ' উপন্যাসে সুখময়ীর স্বামীর কণ্ঠে উচ্চারিত এই সংলাপ চিনিয়ে দিচ্ছে পরিবর্তনশীল সময়ের প্রেক্ষিতে মেয়েদের সম্বন্ধে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। অথচ মেয়েরা যেন পূর্বনির্ধারিত সামাজিক ছকটাকেই বেশি মান্যতা দিয়ে সেখানেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছে, এই স্ববিরোধও চোখে পড়ে।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (জন্ম ১৯০৫) দীর্ঘদিন স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন, অথচ তাঁর উপন্যাসেও সনাতন

সংস্কার থেকে মুক্ত মেয়েদের প্রায়শ দেখা যায়নি। তাঁর লেখায় স্কুল কলেজে যাওয়া শিক্ষিতা মেয়েদের উপস্থিতি দেখা যায়। কিন্তু মানসিকতায় তারা 'সেকালিনী'র অনুবর্তিনী যেন। তাই তাঁর 'ঘূর্ণি হাওয়া' (১৯৩৪) উপন্যাসে দেখি কল্যাণী তার বিপথগামী স্বামী বিশ্বপতিকে সংসারে ফেরাতে না পেরে অপমানে অভিমানে নিজেই গৃহত্যাগ করে গেছে। পরে ফিরেও এসেছে এবং স্বামীর কাছে আশ্রয়ভিক্ষা করেছে।

দাসীর মতো, একপাশে পড়ে থাকবার মতো এতটুকু স্থান কি আমায় দেবে না?

বিশ্বপতির কাছে স্বৈরিণী চন্দ্রার মূল্য আছে, পত্নী কল্যাণীর মর্যাদা নেই। কল্যাণী স্বামিত্বের আদর্শকেই শেষপর্যন্ত বড়ো করে দেখেছে, সাময়িক প্রতিবাদ তার জীবনে স্থায়ী হয়নি, নিজের সতীত্বের কথা স্বামীকে জানিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। এইভাবে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে পুরুষকাঙ্খিত আদর্শ নারীর চিত্র অঙ্কন করেছেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। মাঝে মাঝে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা গেলেও, সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের কথা শোনা গেলেও তা' অগভীর বাক্‌বিলাসই থেকে গেছে; নারীকে পুরুষের ইচ্ছাধীন পুতুল থেকে নিজস্ব স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রতিমায় উত্তীর্ণ করে দেয়নি।

।। তিন।।

উনিশ শতকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী (জন্ম ১৮৫৬), জন্ম নিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া (জন্ম ১৮৮০)। সমকালের অবরোধবাসিনীদের দুর্গতিকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, কিন্তু সেই দুর্দশাকে তাঁরা মেনে নেননি। পারিবারিক একটা সমুন্নত আবহ ছিলই, এবং তাঁরা নিজেরাও ছিলেন এক উদার স্বচ্ছ সংস্কারবিমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার এবং অসহায় বিধবাদের আর্থিক স্বনির্ভর করার অভিপ্রায়ে 'সখিসমিতি' গঠন করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী— তাঁর এই চিন্তা প্রসারিত হয়েছিল তাঁর লেখার জগতেও। তাই পুরুষের প্রতারণা এবং দ্বিচারিতা তাঁর কলমে ধিক্কৃত হয়েছে। বিশ শতকে তাঁর তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে— বিচিত্রা (১৯২০), স্বপ্নবাণী (১৯২১) এবং মিলনরাত্রি (১৯২৫) এবং উল্লেখযোগ্য যে, এই ত্রয়ী উপন্যাসে সমকালের বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দ্রব্যের প্রচল ও প্রসার ইত্যাদি ধারণা ব্যক্ত হয়েছে ত্রয়ী উপন্যাসের নায়িকা স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত স্বদেশহিতে উৎসর্গচিত্ত রাজকন্যা জ্যোতির্ময়ীর মাধ্যমে। সেদিক থেকে বলা যায়, তাঁর এই উপন্যাস-ত্রয়ীতে পারিপার্শ্বিক দেশকাল যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, তাতে প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাসের সূত্রপাত যেমন হয়েছে। উনিশ শতকের উত্তরাধিকার বহন করেও বিশ শতকে সময়ের অনেকটাই আগে যাঁরা পথ হেঁটেছিলেন, তাঁদেরই একজন বেগম রোকেয়া। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটি বিশ শতকের সূচনায় লেখা হলেও প্রকাশিত হয়েছে দু-দশক পরে, ১৯২৪-এ। এবং রোকেয়া সম্যক বুঝেছিলেন—

> ''শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন।''

পুরুষের আরোপিত সহ মহত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে সংসারে মেয়েরা যাতে পুরুষের সহচরী, সহকর্মী ও সহধর্মিণী হতে পারে— এই ছিল রোকেয়ার প্রত্যাশা। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের সিদ্দিকা আত্মমর্যাদায় উজ্জ্বল এক নারী। বিবাহ এবং লতিফ উভয়ের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ সত্ত্বেও সিদ্দিকা লতিফকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক, কারণ কৈশোরে ধর্মীয় রীতিতে তার সঙ্গে বিবাহ হলেও পরে অভিভাবকদের চাপে লতিফ আর একটি বিবাহ করতে বাধ্য হয়। তার সে পত্নী মারা যায়। কিন্তু সিদ্দিকা দোজবরের সঙ্গে ঘর করার কথা ভাবতে পারে না। একদিক থেকে সিদ্দিকা যেন রোকেয়ার মানস-প্রতিমা। সিদ্দিকা বলেছে—

> আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন?...আমি যদি উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকট ধরা দিই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা ঠাকুমাগণ উদীয়মান তেজস্বিনী রমণীদের বলিবেন, ''আর রাখ তোমার পণ ও তেজ—ঐ দেখ না এতখানি বিড়ম্বনার পর জয়নব আবার স্বামীসেবাই জীবনের সার করিয়াছিল।'' আর পুরুষ সমাজ সগর্বে বলিবেন, ''নারী যতই উচ্চশিক্ষিতা উন্নতমনা তেজস্বিনী মহীয়সী গরীয়সী হউক না কেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার আমাদের পদতলে পড়িবেই পড়িবে।'' আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসারধর্মই জীবনের সারমর্ম নহে।

বিপ্লবাত্মক উক্তি নিঃসন্দেহে। সমকালে নারী-ঔপন্যাসিক তো বটেই, কোনো পুরুষ-লেখকও তাঁর উপন্যাসে মেয়েদের এতটা বলিষ্ঠ সোচ্চার দেখাতে পারেননি। সনাতন সামাজিক ঐতিহ্যের কাছে আত্মসমর্পণই যেখানে প্রথা, সেখানে সিদ্দিকা তার জয়নবের এই প্রত্যয়ী উচ্চারণ ব্যতিক্রম বইকি! দীনতারিনীর 'তারিণী ভব' বিধবা ও বালিকাদের আত্মনির্ভর স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত, বাস্তবে রোকেয়া যে ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশ তৈরি করতে পারেননি তাঁর সাখাওয়াত মেমোরিয়ালে, তারিণীভবনে সেই স্বপ্নই যেন পূরণ হয়েছে। এইভাবে স্বর্ণকুমারী দেবী এবং বেগম রোকেয়ার হাত ধরে বাঙালি নারী ও বাংলা উপন্যাস অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে এসেছিল। নারীকে আত্মবিকাশ ও সংস্কারমুক্তির পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলেন এই দুই নারী, পুরুষের সুবিধা ও স্বার্থনির্মিত সমাজে মেয়েদের নিজস্ব জায়গাটিকে চিনিয়ে দেবার স্বেচ্ছাব্রতধারিণী ছিলেন তাঁরা, বাংলা উপন্যাসে নারীর আদর্শায়িত জগতের পুরুষ রচিত ফাঁকিটুকুকে চিহ্নিত করে নারীর বিচারহীন প্রশ্নহীন

আনুগত্যকে আত্মজিজ্ঞাসায় উন্মুক্ত করে তুলেছিলেন।

।। চার।।

পুরোবর্তিনীদের এই মনোভাবকেই সম্মান জানিয়ে জীবনের পথে মেয়েদের নিজস্ব জায়গাটুকু চিনে নেবার লক্ষ্যে আরো সহযোগিতা করেছিলেন 'প্রবাসী' - সম্পাদকের দুই কন্যা শান্তা দেবী (জন্ম ১৮৯৪) ও সীতা দেবী (জন্ম ১৮৯৫)। ব্রাহ্ম পরিবারে অনেকটাই উদার সংস্কারমুক্ত মানস - পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন বলেই বোধহয় তাঁদের উপন্যাসে শিক্ষিত আর্থিক স্বনির্ভর মেয়েদের দেখা মেলে। শান্তা দেবীর 'চিরন্তনী' কিংবা সীতা দেবীর 'রজনীগন্ধা' উপন্যাসে করুণা এবং ক্ষণিকা দুজনেই শিক্ষিকা; চাকরি নিয়ে গ্রামে গেছে, দুজনেই গরিব ঘরের মেয়ে এবং দুজনেই ধনী প্রণয়ীর সঙ্গে কিংবা বাল্যবন্ধুর সঙ্গে মিলনে জীবনে সার্থকতা পেয়েছে অবশ্যই কিছু টানাপোড়েনের পর। পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজের অনুশাসনের বিরোধিতা অবশ্য এঁদের লেখাতেও নেই, তবে প্রেমের ব্যর্থতা তাঁদের নায়িকাদের জীবন চিনিয়েছে— হতাশায় ডুবে না গিয়ে তারা স্বাধীনভাবে সঙ্গী খুঁজে নিয়েছে, কোনো মহতী আদর্শের লোভে জীবন কাটায়নি। সীতা দেবীর 'পথিকবন্ধু' উপন্যাসের নায়িকা অনিন্দিতা যেমন, প্রণয়ীর বিশ্বাসভঙ্গে অপমানিত বোধ করলেও সেই দুঃখেই জীবন কাটিয়ে দেয় না, পথিকবন্ধু দেবপ্রিয়র সঙ্গে শেষপর্যন্ত ঘর বাঁধে। চিন্তার এই স্বাধীন জগৎটা দুই ভগ্নীর উপনাসে ধরা পড়েছে।

তবে পুরুষের আধিপত্যে অসহায় দুর্বল মেয়েদের প্রাণান্তকর অবস্থা তীব্রভাবে অনাবৃতভাবে তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপন করেছিলেন শৈলবালা ঘোষজায়া (জন্ম ১৮৯৪)। স্বামী-স্ত্রীর সমানাধিকারের উপর, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত যে দাম্পত্য সম্পর্ক— সেইসময়ে তা ছিল শুধু ভাবনার বৃত্তে, বাস্তবের ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ এর বিপরীত। সেখানে নারী যেন 'জন্ম-অপরাধী' 'জন্ম অভিশপ্তা', স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে করতে কখনও সে আর্তনাদ করে ওঠে—

> পুর্ণিপুকুর, দশ পুতুল আর রান্নাঘর, দোহাই ঈশ্বর, সত্যি বলো, এছাড়া পৃথিবীতে আর কোনোকিছুর ওপর ন্যায্য অধিকার কি আমাদের কিছুই নাই?

সহচরীর মর্যাদা তো স্ত্রী পায়ই না, বরং তার নিজেকে 'জন্মজন্মন্তরের সম্পর্কের চুক্তিকে মন্ত্রবলে কেনা' ক্রীতদাসী মনে হয়। এই নারী জীবনই কি তার প্রার্থিত ছিল? সমাজে সব অধিকার থেকেই তো সে বঞ্চিত—পিতা কন্যাকে গলগ্রহ মনে করে, স্বামীর কাছে প্রতিমুহূর্তে অপমানিত হয় আর ভবে—

> বাংলাদেশের মেয়েকে চিরদিনই পরের গলগ্রহ থাকিয়া গ্রাসাচ্ছাদন জোগাড় করিতে হয়, খাটিয়া খাইবার সকল পথ তাহাদের কাছে রুদ্ধ, তাই অনুগ্রহ-ভিক্ষাপুষ্ট পরাধীন জীবনে লাঞ্ছনা-পীড়নের সীমা নাই!

শৈলবালা তাঁর 'সেখ আব্দু' (১৩২৪) উপন্যাসে মুসলমান পুরুষের সঙ্গে হিন্দু নারীর প্রেমকে বিষয় করে একটা সামাজিক বিপ্লবই ঘটিয়েছিলেন, নারী-পুরুষের প্রেমানুভবকে কোনো ধর্মগত জাতিগত পরিসীমায় বেঁধে না রাখায় দুঃসাহস সেদিন লেখিকা দেখাতে পেরেছিলেন, সেখানে তিনি শ্রদ্ধার্হ। কিন্তু পিছুটান তাঁরও ছিল, তাই 'স্নিগ্ধা' (১৯৩৩) উপন্যাসে দেখা যায়, স্বামীর কাছ থেকে কেবল অপমান আর লাঞ্ছনা পেলেও সেই স্বামী-পরিচয়কে স্নিগ্ধা কখনও অস্বীকার করতে পারেনি। এমনকি তার দাদামশাই (হয়তো সমাজের অভিভাবক) স্নিগ্ধাকে বলেছে—

> তুমি হিন্দু স্ত্রী। স্বামী তোমাকে ত্যাগ করতে পারেন, তাড়িয়ে দিতে পারেন, উৎপীড়ন করতে পারেন, যা খুশি তাই করতে পারেন, — কিন্তু হিন্দু স্ত্রীর জন্য শাস্ত্রকাররা সে সব যথেচ্ছাচারের অধিকার রাখেননি। হিন্দু স্ত্রীর কাছে স্বামী সেবাই পরম ধর্ম। তা সে স্বামীটি যত অত্যাচারী, যত ভয়ানকই হোন ত্যাগ করবার অধিকার হিন্দু স্ত্রীর নাই।

স্ত্রীজাতির কোনো স্বাতন্ত্র্য নাই, পিতার সম্পত্তিতে কোনো অধিকার নাই, স্বামীর দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও সমাজ মেনে নেয় না— এমনই এক সর্বাত্মক না-এর অসহায়তার মধ্যে অতিবাহিত হয় মেয়েদের জীবন। শৈলবালার 'অরু' (১৩৪৬) উপন্যাসে দেখা মেলে প্রতাপের মতো দুবৃত্ত স্বামীর আর অরুন্ধতীর মতো 'হিন্দু স্ত্রী'র। অরু প্রচুর লাঞ্ছনা সহ্য করেছে, ''তবু স্বামীকে মিথ্যা বলিয়া ঠকাইতে আজও তার ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে, নৈতিক চেতনা আহত হয়।'' শঠ দৈবজ্ঞের প্রতি অতি বিশ্বাসের হঠকারিতা শেষপর্যন্ত প্রতাপের মৃত্যু ডেকে এনেছে, এবং শৈলবালা তারপর তাঁর নায়িকাকে গ্রামে মেয়েদের শিক্ষাদানের মহতী ব্রত নিয়োজিত করেছেন। দু-চারজন মৃণাল হয়তো গৃহত্যাগ করতে পারে, কিন্তু সকলের সে সাধ্য থাকে না। ইচ্ছা করলেই মেয়েরা যে চৌকাঠ ডিঙিয়ে যেতে পারে না, সে কথা শৈলবালা কিংবা জ্যোতির্ময়ীদের মতো মেয়েরা ভালোই জানতেন। তাই নীরবে অত্যাচার সহ্য করার ছবি তাঁদের লেখায় যত বেশি রয়েছে, প্রতিবাদে ঘর ছেড়ে যাবার কথা তত নেই, অলীক স্বপ্নের কল্পলোক তাঁরা রচনা করেননি।

জ্যোতির্ময়ী দেবী (জন্ম ১৮৯৪) শৈলবালা ঘোষজায়ার সহযাত্রিণী, কিন্তু জীবনের এক বিশেষ পর্বে এসে, সাহিত্য ভাবনার এক বিশেষ পর্বে এসে তিনি স্বতন্ত্র— মানসিকতায় যেমন, লেখার ক্ষেত্রেও তেমনই। সময়ের সরণিতে ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমির বহ্নিবলয়ের মধ্যে দিয়ে অনেকদূর হেঁটে এসে নিজের জীবনের ব্যাপারে তখন নিজেরা সিদ্ধানত নিতে শুরু করেছে মেয়েরা। স্বোপার্জনের মাধ্যমে তখন তারা অনেকটা স্বনির্ভর, এবং আর্থিক স্বাবলম্বন মেয়েদের অনেকটা আত্মবিশ্বাসী করে তুলছে। ফলে বীণার মতো কালো মেয়েরা নিজের

পায়ে দাঁড়িয়ে দেখতে চেয়েছে সম্পর্কের নাম খ্যাতিতে ছাড়িয়ে গিয়ে তার নিজস্ব কিছু আছে কিনা। 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' (১৩৫৫) উপন্যসে জ্যোতির্ময়ী দেবী তার বীণকে গান্ধীজির রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞে সামিল করে দেন। সহকর্মী নীতিশের মৃত্যুতে বীণার প্রেম যথার্থ প্রকাশের 'নাহি পায় পথ', কিন্তু বীণা বিবাহের ক্ষেত্রে নিজেদের দর যাচাই করার জন্য বসে থাকেনি। রাজনৈতিক আদর্শে দীক্ষিত হয়ে প্রসারিত করেছে তার জীবনর পরিধি, স্বনির্ভর হয়েছে, সহমর্মী পুরুষের সখ্যে খুঁজেছে জীবনের অর্থ। নিজস্ব সহজ অন্তর্দৃষ্টিতে বীণা ব্যাখ্যা করেছে গান্ধীজির ডান্ডি অক্ষিভিযানের লবণযাত্রার তাৎপর্য—

> ''এতো শুধু নুনের কথা নয়, আহার্যে একান্ত দরকারি নুনের মতোই জীবনে স্বাধীনতার কথা। আসলে মনে হয় মহাত্মাজি যেন নুনের রূপকে জানাচ্ছেন, আমাদের প্রতি গ্রাসের আহার্যে নুনের মতোই স্বাধীনতাও জীবনে অপরিহার্য। নুনহীন তরকারির মতো স্বাধীনতাহীন জীবনও বিস্বাদ।''

বলা বাহুল্য, গান্ধীজির ডান্ডি অভিযানের এই ব্যাখ্যা বীণার নিজস্ব পাঠ, হয়তো 'মেয়েলি পাঠ', কিন্তু ভারত-উপনিবেশের স্বাধীনতা - আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরাধীন পিঞ্জরাবদ্ধ মেয়েদের মুক্তি-কল্পনায় গভীর তাৎপর্য আছে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর প্রথম উপন্যাস 'ছায়াপথ'—সাধারণ বাঙালি জীবনের পণপ্রথা আর কন্যাদায়ের চেনা ছক সেখানে, কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সে স্বামী হারিয়ে ছয়টি সন্তান নিয়ে যে পিতৃগৃহে ফিরে যেতে হয় জ্যোতির্ময়ীকে, আর্থিক নিরাপত্তা সত্ত্বেও 'আশা আনন্দহীন নির্বান্ধব' এক জগতে শুরু হয় তাঁর বেঁচে থাকার সংগ্রাম— সেই অচেনা পথে একা হাঁটতে হাঁটতে নারীজীবনের মৌল কিছু সমস্যা তাঁকে আলোড়িত করে এবং নিজের মতো করে উত্তর খোঁজেন তাঁর গল্পে উপন্যাসে। তাই 'ছায়াপথ' -এর নায়িকা অর্থলোভী পাত্রপক্ষের কাছে অপমানিত হয়ে প্রশ্ন তুলেছিল —পুরুষের পণপ্রত্যাশাকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিল—

> আমাকে বাংলাদেশের পাত্রদের—সৎপাত্রদের কনে দেখিয়ে বিয়ে দিতে পারবে না। আমার মনে হয়, যাদের সঙ্গে তোমার আমাদের বিয়ে দাও, ওরা পুরুষমানুষ নয়। ওরা মার কোলে জন্মায় বিয়ের পাত্র হয়ে, আর তারপরে হয় পিতা, অর্থাৎ পাত্র ও পিতা এই দুটো মাত্র অবস্থা ওদের, সুতরাং আমরাও থাকি পাত্রী, তারপর হই ছেলের বা মেয়ের মা । আমার পক্ষে ঐ ধরনের পাত্রীত্ব বা মাতৃত্ব দুয়ের একটিও আর সম্ভব হবে না। কেন না আমি মন যোগাতে পারব না। আর তাছাড়া মানুষের মন যে এমন একটা জিনিস তা দেব কাকে? ওরা তো মনের কিছুই বোঝে না। নিজেদের মনের দারিদ্র এত বেশী যে, ধন দিয়েই ওরা তা পূর্ণ করতে চায়।''

সুপ্রিয়া বিবাহ করেছিল দাদার বন্ধু বিভাসকে, কিন্তু দূর প্রবাসে শিক্ষকতার চাকরি সে ছাড়েনি। রবীন্দ্রনাথের 'অপরিচিতা'-র কল্যাণীকে মনে পড়বে, বিবাহসভায় যৌতুকের তুলাদণ্ডে তার বিচার হয়েছিল, লগ্নভ্রষ্টা কল্যাণী আর বিবাহ করেনি, নিজেকে নিয়োজিত করেছিল বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে। সুপ্রিয়ারা সেই উত্তরাধিকার বহন করেও আরো অনেক দূর এগিয়ে গেছে। শিক্ষায় স্বোপার্জনে আত্মবিশ্বাসে নিজেদের অবস্থান সমাজে পরিবারের সুনিশ্চিত করতে পেরেছে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর শেষ উপন্যাস 'হরিজন উন্নয়ন কথা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৪-তে, উপন্যাসের বিষয় প্রসারিত হয়েছিল ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে, অভিজাত মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবর্গের এলাকায়, সে আলোচনা ভিন্ন পরিসর দাবি করে। কিন্তু বিশ শতকের প্রথামার্ধে প্রকাশিত এই দুই উপন্যাসেই তিনি তাঁর মননের ব্যাপ্তিকে পাঠকের কাছে চিনিয়ে দিয়েছিলেন।

আশালতা সিংহ (জন্ম ১৯১১) তাঁর প্রথম উপনাস 'অমিতার প্রেম' (১৯৩৪) লিখেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আশালতা সিংহ তার জীবনে উত্থানপতনের অনেক বন্ধুর পথ পার হয়ে হয়ে উঠেছিলেন সন্ন্যাসিনী আশাপুরী, এবং তাঁর লেখায় তিনি বিকীর্ণ করেছিলেন তাঁর মনস্বিতা, তাঁর বৈদগ্ধ্যের দ্যুতি। আশালতার নায়িকারা তাদের প্রেমে সমাজের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে, প্রণয়ীকে তারা নিজেরাই নির্বাচন করে নেয়। এবং সমাজে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চয়। বিয়ে করা ছাড়াও মেয়েদের জীবনের যে অন্য অর্থ আছে, একথা তাঁর 'পরিবর্তন' উপন্যাসে মাধবীর মায়ের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন আশালতা। মাধবী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, কন্যা অভিভাবকের কাছে আর যেন 'দায়' নয়— মাধবীর মা যখন বলেন—

> যখন ভালো পাত্র পাব, তখন বিয়ে দেব। তাই বলে কখন বিয়ে হবে সেই প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়ে দেওয়াই কি ওর জীবনের উদ্দেশ্য? ওর নিজের জীবনের একটা মানে আছে।

তখন মনে হয়, মাধবীদের আগের প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গিও কালের নিয়মে বদলে যাচ্ছে। মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে নিজস্ব ভাবনাচিন্তা ছিল আশালতার। 'কলেজের মেয়ে' (১৯৩৮) ইত্যাদি উপন্যাসে তা ব্যক্ত হয়েছে। কখনও সেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রতিধ্বনিও শোনা গেছে, তবু তাঁর নিজের মতামত তিনি অকপটে স্পষ্টভাষায় প্রকাশও করেছেন। 'দুই নারী' (১৯৩৪) উপন্যাসে তিনি আধুনিক শিক্ষার ভিতরকার অসম্পূর্ণতাকে চিহ্নিত করেছিলেন এইভাবে—

> ''আধুনিক শিক্ষার মস্ত বড়ো গলদ একটা কোথায় রয়েই গেছে। সে শিক্ষা কেবল এ জিনিসের খানিকটা, ও জিনিসের খানিকটা, টুকরো টুকরো তত্ত্বই জানাল। আর এড়িয়ে গেল আসল কাজটা, জীবনকে একটা সুসম্পূর্ণ ভঙ্গি দেওয়া, একাট সত্যসন্ধানী দৃষ্টি (Outlook) গড়ে দেওয়া।''

এই সত্যান্বেষণের আত্মানুসন্ধানের যাত্রাপথেই লেখা হয়েছে আশালতার উপন্যাস। কখনও তা' প্রচলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উচ্চকিত, কখনও সনাতন মূল্যবোধের কাছে নতজানু। কিন্তু স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য

যে, সমাজে নারীর অমর্যাদাকর অবস্থানটিকে চিনিয়ে দিয়ে আশালতার নারীর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর নায়িকাদের।

আশাপূর্ণা দেবী (জন্ম ১৯০৯) কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন মূলত বিশ শতকের অপরার্ধে। এই প্রবন্ধে সময়ের যে পরিসর নির্বাচিত, সেখানে তাঁর মাত্র দুটি উপন্যাসের নাম করা যায়— 'প্রেম ও প্রয়োজন' (১৯৪৪) এবং 'অগ্নিপরীক্ষা' (১৯৪৬) —এবং এখানে আশাপূর্ণার প্রতিভার যে পূর্ণ ও পরিণত স্বাক্ষর আছে এমন বলা বোধহয় যায় না। তবে প্রথম উপন্যাসেই আশাপূর্ণা দুই সাহসিনীকে হাজির করেছিলেন বাঙালি পাঠকের সামনে এবং মেয়েদের গৃহকোণে বংশবদ দেখতে অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত সমাজ সেদিন একটু ধাক্কাই খেয়েছিল। আদর্শ পত্নীর ঘেরাটোপ ভেঙে বেরিয়ে এসে দেবরের বন্ধুর সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল আরতি, মন্দিরা নিরুদ্দিষ্ট প্রেমিককে খোঁজবার জন্য পথে নেমেছিল—আশাপূর্ণা এখানে হয়তো এক ধরনের ইচ্ছাপূরণের কাহিনীই রচনা করেছেন, সংস্কারের বন্ধন যে উপেক্ষা করছেন মেয়েরা, এখানে তার প্রমাণ আছে। যদিও তাঁর 'অগ্নিপরীক্ষা'-র বিপুল জনপ্রিয়তা দেখিয়ে দেয় প্রতিবাদী চেতনা অপেক্ষা সনাতন ঐতিহ্যের কাছে আত্মসমর্পণই সমাজে যেন অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত। আবার বিবাহিত নারী স্বামী বর্তমানে অন্য পুরুষের প্রতি যে শুধু আকৃষ্ট হচ্ছে তা-ই নয়, তাকে বিবাহ করে নতুন ঘর বাঁধছে—প্রতিভা বসুর (জন্ম ১৯২৫) প্রথম উপন্যাস 'মনোলীনা' (১৯৪৪) বুঝিয়ে দেয় সমাজে মেয়েরা এখন নিজেদের মনোবাসনাকে নিঃসংকোচে নির্ভয়ে প্রকাশ করতে পারে, একাধিক বিবাহ এখন আর পুরুষের একচেটিয়া নয়। পরবর্তীকালে তাঁর উপন্যাসগুলিতে প্রতিভা বসু মেয়েদের স্বাধীন ইচ্ছাকে আরো অনেক বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

এইপর্বে নারীর শরীরীবাসনার তীব্রতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বাংলা উপন্যাসের ধারায় ঘুর্ণি নিয়ে এসেছিলেন বাণী রায় (জন্ম ১৯১৮)। গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ি'-র উত্তরাধিকার বহন করেও নারীর যৌবনবাসনার এক ইন্দ্রিয়দীপ্ত অকুণ্ঠ প্রাকশে বাণী রায় সমস্ত সংস্কারকে ভেঙে দিয়েছিলেন। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'প্রেম' -এর অংশমাত্র প্রকাশ হওয়া মাত্র সমালোচনার ঝড় ওঠে, এবং মোহিতলাল মজুমদারের নির্দেশে সজনীকান্ত দাস উপন্যাসটি প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই উপন্যাসের নায়িকা রূপালী তার কৈশোর থেকেই বিনিদ্র রাত্রিযাপন করত স্ত্রী-পুরুষের যৌনমিলনের খুঁটিনাটি কল্পনায় এবং 'মনের কল্পনাতে তার বহু প্রিয়ের সঙ্গে সে বহুবার মিলিত হয়েছে গোপনে।' সমকালের কিছু উপন্যাসে পুরুষ - শরীরের প্রতি নারীর আকর্ষণ প্রকাশিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বাণী রয়ের উপন্যাসে নারী তার যৌনকামনার প্রকাশে কোনো আড়াল রাখেনি। একাধিক পুরুষের সঙ্গে প্রেমহীন শরীরী ক্রীড়ায় জীবনকে একভাবে আস্বাদ করেছে। 'প্রেম' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৩-এ, পরবর্তীকালে 'শ্রীলতা ও শম্পা' কিংবা 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' উপ্যাসেও বাণী রায় নারীর শরীরীপ্রেম বিষয়ে যাবতীয় সংস্কারকে নস্যাৎ করেছিলেন।

বিবাহ ও দাম্পত্যসম্পর্ককে কতগুলি কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন আমোদিনী ঘোষ তাঁর 'ফস্কা গেরো' (১৩৩৮) ও 'দীপের দাহ' (১৯৩৪) উপন্যাসে। বৃদ্ধ পতি আর তরুণী ভার্যা বাংলা উপন্যাসে বারবারই উপস্থিত হয়েছে, বৃদ্ধ পতিকে কখনও মনে মনে মেনে নিয়ে কখনও মনে মনে মেনে না নিয়েও বালিকা বা তরুণী পত্নী 'সংসারধর্ম' পালন করেছে হাসিমুখে। আমোদিনীর 'ফস্কা গেরো' উপন্যাসে মুরারির পত্নী হিসেবে নিজেকে মেনে নিতে পারেনি চন্দ্রলেখা, নিজের মন থেকেও নয়, সমাজের স্বার্থে বিবাহের মন্ত্রশক্তিতেও নয়। বরং তার মন আকৃষ্ট হয়েছে মুরারির ভ্রাতুষ্পুত্র অনিলের প্রতি। আর এইখানেই চন্দ্রলেখার যন্ত্রণা। তার রক্তাক্ত হৃদ্‌পিণ্ড সে নিজে উন্মোচন করেছে—

> দয়িত হইয়া যে পাশে দাঁড়াইতে পারিত, সে দাঁড়াইল পুত্রস্থানীয় হইয়া, আর বাপের বয়সী সে পুরুষ জীবনের প্রদোষবেলায় পঁহুছিয়াছে, সে দাঁড়াইল স্বামীর আসন অধিকার করিয়া।

হৃদয় আর কর্তব্যের টানাপোড়েনে অবিরত বিক্ষত হতে হতে চন্দ্রলেখা মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মুক্তি খুঁজেছে। বৈধব্যের বেশধারণ করে যখন সে আত্মহত্যা করে, তখন সে বিদ্ধ করে যায় সমাজের হৃদয়হীন নিয়মগুলিকে। যে সমাজ ব্যক্তিকে নিজের মতো করে বাঁচতে দেয় না, প্রাণের অপচয় ঘটায়; সমাজের সেইসব ভঙ্গুর বিধিনিষেধগুলোকে বিদ্রূপ করে চন্দ্রলেখার আত্মহনন। আমোদিনী তাঁর নায়িকাকে ইচ্ছা করলে উদ্ধার করতে পারতেন এই শ্বাসরোধী বিবাহিত জীবনের বদ্ধতা থেকে, কিন্তু সেই কল্পকথার চেয়ে তাঁর কাছে অনেক বেশি জরুরি মনে হয়েছে অসমবিবাহের সম্পর্কের ফস্কা গেরোটিকে দেখানো, বাঁচতে-চাওয়া একটি জীবনের নিরুপায় মৃত্যুর ট্র্যাজেডিকে পরিস্ফুট করা। সমকালে অন্য পুরুষ - উপন্যাসিকরা যেখানে স্বামী সর্বতোভাবেই পূজনীয় বলে সেই সাপেক্ষে হিন্দু নারীর সতীত্বের জয়গান করে তৃপ্তিবোধ করেছেন, বৃদ্ধের তরুণী পত্নীর মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে কোনোভাবে আমল দিতে চাননি; সেখানে নারী হয়ে আমোদিনী নারীর যন্ত্রণা আর বিপন্নতাকে অনেক সহমর্মিতার সূত্রে চিনে নিতে পেরেছিলেন, এইখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। 'দীপের দাহ' উপন্যাসে লেখিকার বিদ্রোহ যেন আরো খনিকটা এগিয়ে গেছে— সুপ্রিয়া মতিলালকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছে, অথচ কঙ্ক তার প্রেমিক, তাকেই মনে মনে বরণ করেছে সুপ্রিয়া স্বামীত্বে। মতিলাল কঙ্কর সঙ্গে সুপ্রিয়ার সংসার করার সুযোগও করে দিয়েছে এবং সুপ্রিয়ার সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে আমোদিনী সামাজিক বাস্তব একটি সমস্যাকেই চিহ্নিত করেছেন।

বোঝা যায়, নারী-পুরুষের সম্পর্ক সামাজিক কিছু প্রথা, কিছু রীতিনীতিকে ক্রমশ নতুন এবং কঠিন কিছু জিজ্ঞাসার মুখোমুখি করে দিচ্ছে। সমস্যা আগে একেবারে ছিল না এমন হয়তো নয়, কিন্তু ত' থাকত অন্তরালে গোপনে, কিন্তু সম্পর্কের পরিবর্তনে— অধিকার বুঝে নেওয়ার মানসিকতার বিষয়গুলি নতুন চিন্তা নতুন মনোযোগ দাবি করছে।

।। পাঁচ।।

কিন্তু নারী-পুরুষের সম্পর্কের এইসব নানাবিধ বিন্যাসের বাইরে পড়ে থাকা জীবনের বিপুলতাকে যাঁরা কলমের আঁচড়ে ধরতে চাইলেন তাঁরা হলেন সাবিত্রী রায় (জন্ম ১৯১৮), বিমলপ্রতিভা দেবী কিংবা শান্তিসুধা ঘোষ। এঁদের হাতে বাংলা উপন্যাসের পরিধি স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ইতিবৃত্তে থেকে প্রসারিত হয়ে গেল সমকালীন রাজনীতি - অর্থনীতির কিছু প্রশ্নে। এইসময় প্রকাশিত হচ্ছে বিমল প্রতিভা দেবীর 'নতুন দিনের আলো' (১৯৩৩), শান্তিসুধা ঘোষের '১৯৩০ সাল' এবং সাবিত্রী রায়ের 'সৃজন' ১৯৪৬)। বিমলপ্রতিভা এবং শান্তিসুধা দুজনেই ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে একাধিকবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা। সুভাষচন্দ্র বসুর পরামর্শে বিমলপ্রতিভা নারী সত্যাগ্রহ- বাহিনী গড়েছিলেন, মেয়েদের মধ্যে প্রথম ইশান স্কলার শান্তিসুধা যুগান্তর দলের সক্রিয় বিপ্লবী ছিলেন। সমকালের রাজনীতির নানা মতবাদ নানা টানাপোড়েনের প্রত্যক্ষ অভিঘাত রয়ে গেছে হিজলীর বন্দীশিবিরে বসে বিমলপ্রতিভার লেখা 'নতুন দিনের আলো' উপন্যসে। যা প্রকাশের পক্ষকাল পরেই ব্রিটিশ শাসকের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হয়। দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের স্বপ্ন ছড়িয়ে রয়েছে এই উপন্যাসের পৃষ্ঠায়। আর শান্তিসুধার উপন্যাসে এসেছে ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ছবি। এর পাশাপাশি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানের যোগদানের ফলেই যে কল্যাণকার ভারতবর্ষের সূচনা হবে এমন তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য রয়েছে। পরাধীন স্বদেশভূমির বেদনাকে এঁরা অনুভব করেছিলেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিঃস্বার্থ অংগ্রহণ - করেছেন এবং দেশের এই অবস্থাই চিত্রিত হয়েছে তাঁদের উপন্যাসে। বাংলা কথা - সাহিত্যের ধারায় এঁরা স্বল্প আলোচিত, কিন্তু এঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

রাজনীতির সঙ্গে নারীর আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটিকে সম্পৃক্ত করে উপন্যাস লিখেছেন সাহিত্রী রায়। ১৯৪৬ সালে 'সৃজন' প্রকাশিত হয়েছে, পরবর্তীকালে রচিত মেঘনাপদ্মা, ত্রিস্রোতা, স্বরলিপি, বদ্বীপ প্রভৃতি উপন্যাসেও বিষয়টি বিস্তার পেয়েছে। সাহিত্রী রায় নিজে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মতাদর্শগত পার্থক্য তাঁকে একসময় দলের সংস্রব থেকে অপসৃত করেছিল, কিন্তু আদর্শে অবিচল ছিলেন তিনি। 'সৃজন' উপন্যাসে ধরা রয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী গোপন আন্দোলনের ছবি, মার্কসীয় দর্শনের ক্রমবিস্তারের ছবি। বন্দীমুক্তি আন্দোলন-হরতা-জনসভা-মেথর স্ট্রাইক ইত্যাদি নানা ঘটনার টুকরো টুকরো ছবি। সামাজিক দায়বদ্ধতা ছিল লেখিকার, তাই রাজনৈতিক প্রেক্ষিত তাঁর লেখায় নিরপেক্ষভাবে ফুটে উঠেছে। আর তারই সঙ্গে দেখিয়েছেন কালের যাত্রায় কিভাবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে মেয়েরা, শিক্ষা তাদের ব্যক্তিত্বকে তৈরি করছে, প্রেম তাদের বিবাহের সীমায় বাঁধছে না সবসময় বরং বিস্তৃত করে দিচ্ছে তাদের মনের দিগন্ত। স্বাধীন সত্তাসম্পন্ন এইসব মেয়েরা, জয়া রাখীদের মতো মেয়েরা ক্রমশ তাদের জীবনের খুঁজে পেয়েছে।

।। ছয়।।

বাস্তবিক, মেয়েদের উপন্যাসে এইভাবে ধরা পড়েছে সমাজসমস্যা-নারী-পুরুষের সম্পর্কে সংকট— দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির নানা ছবি। সমাজে মেয়েদের অধিকার যখন ছিল সীমিত, নারী যখন পুরুষসমাজের উপেক্ষার সামগ্রী—তখন সাহিত্যের মেয়েরা একভবে প্রতিফলিত হয়েছে। তখন বারবার ফিরে এসেছে কন্যাদায় বাল্যবিবাহ পণ্যপ্রথা বৈধব্যপালনের খুঁটিনাটি বিষয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনে বিষয়টি ভালো মন্দ নিয়ে উপন্যাসের চরিত্রেরা আলোচনা করেছে। এমন একটা সময় এসেছে, যখন জীবিকার সন্ধানে বাইরে পা রাখতে হয়েছে মেয়েদের — তখন আবার বদলে গেছে যুগপৎ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। তখন ভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে পৃথিবী চিনেছে মেয়েরা—তাদের ভালোবাসার অধিকার বিবাহের অধিকার পতি-ত্যাগের অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলি তখন প্রথমসারিতে চলে এসেছে। আবার এই মেয়েদের হাতেই নির্মিত হয়েছে সমকালীন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতার ছবি। পারিবারিক সামাজিক নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে পথ কেটে কিভাবে জীবনের বৃহৎ পরিধিতে পা রেখেছে মেয়েরা, পুরুষের সব চাপানো দায় থেকে কিভাবে মুক্ত করে নিয়েছে নিজেদের, আত্মমর্যাদায় কিভাবে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠেছে তারা— সেই ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসই যেন নিহিত রয়েছে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে লেখা বিভিন্ন উপন্যাসের পৃষ্ঠায়। মেয়েদের চোখে দেখা বলেই অন্দর ও বাহিরমহলের এইসব ছবির পৃথক মূল্য রয়েছে। একদিন গৃহকোণাসীনা নারী অশ্রুপাত করত নীরবে, অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন তার জীবন স্বামীর অবহেলা আর অত্যাচারে অতিবাহিত হয়ে যেতো; কিন্তু শিক্ষার আলোকে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির আলোকে নারী ক্রমশ আবিষ্কার করল শুধু পত্নী কিংবা জননী হিসেবে দিনাতিপাত তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। জীবনের পথে তখন তার যাত্রা শুরু হল নিজেকে খুঁজে পাবার জন্য— সেই পথেই একে একে দেখা দিলেন

বেগম রোকেয়া-গিরিবালা দেবী-শৈলবালা ঘোষজায়া জ্যোতির্ময়ী দেবী-আমোদিনী ঘোষ-আশাপূর্ণা দেবী কিংবা সাবিত্রী রায়ের মতো মনস্বী ও তেজস্বী লেখিকারা। তাঁদের হাত ধরে এতদিনের অবরোধবাসিনী মেয়েদের এক জন্মে জন্মান্তর ঘটে গেলো— পিতৃগৃহ কিংবা পতিগৃহ নয়— নিজস্ব একটি ঘরের খোঁজে করলেন মেয়েরা। সময়ের স্রোতকে নিজস্ব ভঙ্গিতে নিজস্ব বিশ্বাসে চালনা করতে চাইলেন তাঁরা। ভয়বিমুক্ত চিত্তে দুরূহ কাজে নিজেদের পরিচয় দিয়ে জগৎসভায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করলেন মেয়েরা, কালের সেই যাত্রাপথে তাঁদের উপন্যাসগুলিও একটা বড় চিহ্ন রেখে গেল। একদিন 'বামাবোধিনী' পত্রিকার পৃষ্ঠা সিক্ত হত অবরোধবাসিনী মেয়েদের অশ্রুবিসর্জনে, আর ১৯৪৭ -এর 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে' 'জয়শ্রী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা 'সাহিত্য ও সমাজ' শীর্ষক অভিভাষণে সুনির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা—সে ভাষা আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্র, মুক্তচিন্তায় বহ্নিমান—

> আজকের দিনের ভারতবর্ষের মেয়েদের সামনে বিশেষ করে কোন কর্তব্যগুলি প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে তারই কিছু নির্দেশ দিতে চেষ্টা করব।
>
> ১। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করতে হবে।
>
> ২। দুই রাষ্ট্রে যাতে যুদ্ধ না ঘটতে পারে, যাতে মৈত্রীসম্পর্ক স্থায়ী হয়, তার জন্য হিন্দু-মুসলমান মেয়েদের অগ্রণী হয়ে মতামত গঠন করা প্রয়োজন।
>
> ৩। ভারত ও পাকিস্তান—উভয় রাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার জন্য — সেখানে সে দাবি আজও গ্রাহ্য হয়নি— আন্দোলন করতে হবে।
>
> ৪। ভারতীয় গণপরিষদে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এ অধিকার কেবলমাত্র পুঁথিগত হয়ে যাতে না থাকে, তার জন্য যোগ্য শিক্ষা নিতে হবে।
>
> ৫। গণিকাবৃত্তি ও নারীব্যবসা দমন সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য রাষ্ট্রের উপর চাপ দিতে হবে।
>
> ৬। মহিলা সাহিত্যিকদেরও একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে জাতিগঠনে।...মেয়েদের মধ্যে আন্দোলন করে মেয়েদের সকল বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা মহিলাকর্মী ও সাহিত্যিকদের আজ একান্ত প্রয়োজন।
>
> (দ্র: শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত, 'পথের ইঙ্গিত', স্ত্রী, ২০০৭, পৃ. ৬৩-৬৪)

অন্তঃপুরের সীমা ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছে মেয়েদের ভূমিকা—সমাজের এই পালাবদলের ইতিহাসই একভাবে ধরা রয়েছে মেয়েদের লেখায়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে নারী-ঔপন্যাসিকদের রচনা তাই একঅর্থে মেয়েদের আত্মপরিচয়ের সন্ধানে যাত্রার ইতিহাস, এমন বলাই যায়।

সহায়ক গ্রন্থ

- অনুরূপা দেবী—সাহিত্যে নারী : স্রষ্টা ও সৃষ্টি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৪৯
- অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য—বিংশ শতাব্দীর নারী ঔপন্যাসিক পূর্বা। কলকাতা। ১৪০৮
- গোপা দত্তভৌমিক —কথার অলিন্দে। এবং মুশায়ারা। কলকাতা। ২০০৬
- গোলাম মুরশিদ—রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া। বাংলা একাডেমী। ঢাকা। ২০০০
- ভারতী রায় (সংকলিত ও সম্পাদিত)—নারী ও পরিবার-বামবোধিনী পত্রিকা। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা ২০০২
- শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত—পথের ইঙ্গিত : নির্বাচিত সংবাদ সাময়িকপত্রে বাঙালি মেয়ের সমাজভাবনা (১৯২৭-১৯৬৭), স্ত্রী। কলকাতা ২০০৭
- সুতপা ভট্টাচার্য — মেয়েলি পাঠ। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। ২০০০
  মেয়েদের লেখালেখি। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। ২০০৪
  বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য (সংকলিত ও সম্পাদিত)। সাহিত্য অকাদেমি। কলাকাত। ২০০৩
- সুদক্ষিণা ঘোষ— মৃণালের কলম। প্যাপিরাস। কলকাতা। ২০০৭
  মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ২০০৮
- সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদিত)—মেয়েদের কথাকল্প। অক্ষর প্রকাশনী। কলকাতা। ২০১০